Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 10-17
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মহানন্দা’ : প্রবাহ ধারায় নদী ও রাজনীতি

ড. হরিদাস মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক, গৌড় মহাবিদ্যালয়, মঙ্গলবাড়ি, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Narayan Gangopadhyay is a famous name in Bengali literature. He was not only literary writer, he was a real teacher. In the year 1918 a poet, novelist, essayist, short story writer - Narayan Gangopadhyay was born at Baliadingi in Dinajpur, now in Bangladesh. In the stories and novels that have been compiled in his twelve volumes published by Mitra and Ghosh. In the novel 'Mahananda' (1951), there is a mention of the breakdown of the Mahananda, as well as the author mentioning the condition of freedom movement revolutionaries. It will be described in the novel what will be the plan of revolutionaries, and in which direction they will run. As the river changes, so the revolutionaries need to change the thinking. The novel has two parts. The first part is centered around Malda district and its Jodhpur village. And most of the events of the second part are in Calcutta. The main character of the novel created the narrative based on Nitish.

Key words: Mahananda, Narayan Gangopadhya, freedom movement, revolutionaries, Malda, real teacher.

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন থেকে শুরু করে সর্বকালেই বাংলা সাহিত্যে, তথা ভারতীয় সাহিত্যে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কথা বারে বারেই চিত্রিত হয়েছে। কেননা সমাজের একটা বড়ো অংশ এরাই। এরা খেটে খাওয়া অতি সাধারণ মানুষ। তাই মাটি, পাহাড় জল, জঙ্গলের সাথেও এদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এই শ্রমজীবী মানুষের একটা বড়ো অংশের জীবনকে ঘিরে থাকে নদী। তাকে ঘিরেই নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের জীবন, প্রাকৃতিক সম্পদ এই নদীর কুলেই বিকশিত হয়ে ওঠে তাদের সভ্যতা। আবার বিভিন্ন সময়ে নদীকেন্দ্রিক মানবসভ্যতা ও ঐশ্বর্য ধ্বংসও হয়েছে এই নদীর বুকেই। নদীর একটি নিজস্বতা রয়েছে, রয়েছে এক রহস্যময়ী রূপ। সে বেঁচে থাকার প্রেরণা যেমন, তেমনি ধ্বংসের মতো ভয়ঙ্করও।

বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যাও এ পর্যন্ত একদম কম নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’, ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতী’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’, অমরেন্দ্র ঘোষের ‘চরকাশেম’, অদ্বৈত মল্লবর্মণের এর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, প্রফুল্ল রায়ের ‘মাটি আর নেই’, ‘কেয়া পাতার নৌকা’, আব্দুল জব্বারের ‘ইলিশ মারির চর’, বোধিসত্ত্ব মৈত্রের ‘ঝিনুকের পেটে মুক্তো’, চিত্ত সিংহের ‘ঈশ্বর পাটনি’, মনোজ বসুর ‘জলজঙ্গল’, বলরাম রামের ‘মৎস্যগন্ধা’,

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', সুবোধ বসুর 'পদ্মা প্রমত্তা নদী', অমিয়ভূষন মজুমদারের 'গড়শ্রীখন্ড', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা', দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' প্রভৃতি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮ - ১৯৭০) 'মহানন্দা' (১৯৫১) উপন্যাসটির শুরু বর্তমানের নগর সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মহানন্দার পূর্বের প্রাণোচ্ছলতা কীভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, যন্ত্রের কাছে বাঁধা পড়ে কীভাবে সে হাড়িয়ে ফেলছে তার যৌবন সেই কথার মধ্য দিয়েই—

> "অজগর সাপের দু'দুটো ফাঁসের মতো দুটো রেল কোম্পানির ব্রিজ পড়েছে। হিমালয়ের গা থেকে কেটে কেটে ওয়াগনের পর ওয়াগন ভর্তি করছে পাথরে, তারপর সেই পাথর এনে ঢেলেছে মহানন্দার জলে। পাহাড়ি নদীর উদ্দাম প্রাণশক্তি বহুদিন ধরে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সেই জগদ্দল, ফেনিল গর্জন করে উঠেছে ক্ষুদ্র আক্রোশ, ভয়াল শব্দে জলচক্রে ঘুরিয়েছে নিজের অর্থহীন উন্মত্ততার মতো, তারপর 'খেদায়' আটকে পড়া বুনো হাতী যেমন করে পোষ মানে, তেমনি করে আত্মসমর্পণ করেছে দুর্বিনীত মানুষের যন্ত্রবিদ্যার কাছে।" [নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-১৬৩]

এখান থেকে উপন্যাসটি অগ্রগতিতে নদীর অমোঘ প্রভাব ধরা পড়বে এবং নদী হয়ে থাকবে উপন্যাসটির মুখ্য বিষয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক ঘটনা, চরিত্র থাকবে; যেমনটি আমরা দেখেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', অদ্দৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', আব্দুল জব্বারের 'ইলিশ মারির চর' প্রভৃতি উপন্যাসে। এগুলি বাংলা সাহিত্যের নদীকেন্দ্রিকক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। 'আঞ্চলিক' শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হলেও উপন্যাসগুলি সর্বজনীন। পূর্ণাঙ্গ জীবনকে ধারণ করে মহত্তম শিল্প হিসেবে এ ধারার অনেক উপন্যাস কালোত্তীর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

'মহানন্দা' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে এই নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের ভাবনা নিয়ে এগোতে গেলে পাঠক ঠিক সেই স্বাদ পাবে না। কেননা এটিকে ঠিক নদীকেন্দ্রিক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে ধরা যায় না। তবে একথাও বলা যাবে না যে নদীর প্রভাব এখানে নেই। মহনন্দার প্রত্যক্ষ প্রভাব উপন্যাসে না থাকলেও উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার কথা রয়েছে। লেখক তুলে ধরেছেন তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপটিকে। এছাড়াও উপন্যাসটির কুশীলবদের বিভিন্ন সময়ের মনের অব্যক্ত কথাগুলি নদীর পরিবর্তনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যেন চিত্রের মতো। এবং এটাও ঠিক মানব জীবনের পট পরিবর্তন যেন নদীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক ধরতে চেয়েছেন। ইতিহাসের পরিচিত গৌড়ের ইতিহাসকে তিনি যেন আর একটু ডিটেল দিয়ে মুসলিম শাসন ও চৈতন্য দেবের গৌড়ে আগমনে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশকে চিত্রিত করলেন। ইতিহাসকে লেখক অতিরঞ্জিত করেননি। চৈতন্যদেবের আগমন যে মুসলিম শাসকদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। নদীর স্রোতের গতি অপ্রতিরোধ্য, তা সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই উপমায় এখানে চৈতন্যের আগমনের চিত্র আঁকলেন লেখক—

> "সেই পাগল আসছে গৌড়ে। মহানন্দা, ভাগীরথী, কালিন্দী, ফুল্লরা আর টাঙনের জল তার প্রতীক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠছে। হোসেন শাহ প্রমাদ গনলেন, তাঁর দিগ্বিজয়ী তলোয়ার শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারে কিন্তু পাগলকে তিনি ঠেকাবেন কেমন করে? তিনি পারলেন না। মহাপ্রভুর পদপাতে গৌড় ধন্য হল, চরিতার্থ হল রামকেলি, নগরের পথে পথে উঠল নামকীর্তনের কলরোল। হোসেন শাহের সেনাবাহিনী তলোয়ার ধুলোয় ফেলে দিলে, মূঢ় বিস্ময়ে সুলতান স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মহানন্দা, টাঙন, ফুল্লরা, কালিন্দীতে বান ডাকল - ফেঁপে ফুলে উঠল আদি ভাগীরথীর নিস্তেজ মুমুর্ষ প্রবাহ।"[নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-১৬৩]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব গৌড় ভূমির বুকে নিয়ে এসেছিল যে তরঙ্গ অভিঘাত তার প্রসার ঘটেছিল স্বদেশিকতার মধ্য দিয়ে। মহানন্দা উপন্যাস তাই শুধু নদীর ভাঙা গড়ার কথা নয়; নদীর সাথে সাথে ইংরেজ শাসিত গৌড়ভূমিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথাও।

উপন্যাসটিতে দুটো অংশ রয়েছে। প্রথম দীর্ঘ অংশটি মালদহ জেলা ও তার যোধপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয় অংশের ঘটনাগুলির বেশিরভাগই কোলকাতায়। উপন্যাসের মূল চরিত্র নীতীশকে কেন্দ্র করেই আখ্যানভাগ নির্মিত। সে একটি রাজনৈতিক চরিত্র, স্বেদেশি ভাবধারা কৈশোর থেকেই তার মধ্যে জেগেছে। আর তার রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণতা দিয়েছে আরেকটি অন্যতম রাজনৈতিক চরিত্র অলকা। এর পাশাপাশি আরেকটি ভাবধারা আখ্যানে এসেছে তা হল – নীতীশের পিতা আধিপত্যবাদী যতীশ ঘোষের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ। তবে যতীশের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রীতি-নীতি পালনের বাড়াবাড়িটা শুরু হয়েছে সতেরো বছর বয়সী নীতীশের তেরো বছরের কিশোরী স্ত্রী মল্লিকাকে রেখে খুনের দায় জেলে যাওয়ার পর থেকে। আসলে যতীশের সবকিছুই যে শুধুমাত্র ভণ্ডামি ছিল তা নীতীশের ফিরে আসাতেই স্পষ্ট হয়। শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে মল্লিকাকে দেবদাসী করে রাখার ভাবনা যে শুধুই অবদমিত ইচ্ছা পূরণের ইঙ্গিত তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না পাঠকের। আর তারই খোলসা হয়ে যায় যখন আমরা দেখি মল্লিকা সন্তান সম্ভবা হলে হতাশ যতীশ যোধপুরের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সুতাহাটির বামদেব ঘোষের মাঝবয়সী বিধবা বোনের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করে বৃন্দাবন বাসী হয়।

'মহানন্দা' উপন্যাসটিতে কথাকার দুটি ধারাকে একসাথে তুলে ধরেছেন – ইতিহাস ও রাজনীতি। আর ইতিহাস সূত্রেই গৌড়, মহানন্দা এসেছে। তবে এই উপন্যাসের সমগ্র বিচারে রাজনীতিই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। তবে সেটিও এক অর্থে ইতিহাস বটে; মালদহ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের অলিখিত ইতিহাস। যে ইতিহাস বিশেষ ভাবে চিত্রিত করলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কেননা বাংলা কথাসাহিত্যের যে বিশাল বিস্তৃতি সেখানে উত্তরবঙ্গ ও সেখানকার মানুষকে ঠিক হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে হয়। রোমান্টিক, ঐতিহাসিক বাদ দিয়ে আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও উত্তরবঙ্গকে ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে আর যে সমস্ত কথাকার এই ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন এবং তাদের সৃষ্টিকে চিরজীবী করে রেখেছেন, অমিয়ভূষণ মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আর উত্তরবঙ্গের 'গৌড়ভূমি'কে বিশেষ করে তুলে ধরলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এখানকার ছোটো ছোটো অঞ্চল, মানুষের জীবনযাত্রা, ঐতিহাসিক পরিচয় সমস্তকিছুই নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত আরেকটি উপন্যাস 'লালমাটি'তেও তিনি তুলে ধরেছেন 'বরিন্দ্র' ভূমির কথা। উপন্যাসটির 'কথামুখ' অংশে কথাকার আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন এই অঞ্চলের সাথে—

> "সভ্যতার শ্মশান এই বরিন্দের মাঠ। একদা গৌরবান্বিত ছিল জনপদে আর লোকালয়ে; বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে; শিল্পে আর বাণিজ্যে। সেদিনের সেই উজ্জ্বল প্রজ্ঞার নিদর্শনের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রুকুনপুরের অতিকায় শিলাগঠিত দীপাস্তম্ভ।.....একদিন এই নদীগুলিই ছিল বাণিজ্যপথ – তার জীবনসরণি। কিন্তু শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। পলিমাটি পড়ে গর্ত যতই ভরাট হয়ে উঠছে – ততই বন্যার উচ্ছ্বাসিত জলধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। অভিশপ্ত বরিন্দের মাঠ যেন আত্মবিস্তার করতে না পেরে আত্মহত্যা করে চলেছে।"[নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-১৭৬]

'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসের প্রাক্ সূচনাও একইরকম –"দুপুরের খররৌদ্র বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ রিক্ত প্রান্তের ভেতর দিয়ে বাস-এ করে আসছিলাম।...নিবিড় বিন্নাঘাসের মধ্য দিয়ে কাঞ্চন নদীর নীল জল যেখানে এঁকে বেঁকে মহানন্দায় নামতে চলেছে, শেষ পর্যন্ত পথটি সেখানে এসেই থেমে দাঁড়াল।" এই

উপন্যাসটিতেও যেমন বার বার মহানন্দার প্রসঙ্গ এসেছে, তেমনি এসেছে মালদহের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসঙ্গ, এসেছে মালদহের সংস্কৃতি গম্ভীরা ও আলকাপের কথা।

এই আঞ্চলিকতার চিত্রণের প্রতি লেখকের যে আকর্ষণ তা লক্ষ করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসগুলির আঞ্চলিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন—

> "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা' ও 'লালমাটি' উপন্যাসত্রয়ে বঙ্গভূমির প্রাচীন ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব, একদিকে উহার পৌরুষদৃপ্ত সংস্কৃতি ও জনশ্রুতির মধ্যে সংরক্ষিত বিরাট লালমাটির প্রান্তর - কাহিনির বাহিরের পটভূমিকা অন্তর প্রেরণার বিস্মৃতপ্রায় মূল উৎসরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।"[১]

মহানন্দার উৎস থেকে তার অতীত বর্তমানের কথাই শুধু লেখক শোনাতে চাননি, নদীর বিবর্তনে তার পার্শ্ববর্তী মানব জীবনের কথা তুলে ধরাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। আর সে কারণেই আলোচনার মূল বিষয় হয়েছে গৌড় ও সেখানকার জনজীবন। তবে এ 'জনজীবন' শুধুই গৌড়ের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতির কথা নয়। যদিও লেখক এই জনজীবনকে বারে বারে মহানন্দার ধ্বংসের সাথে তুলনা করে আফসোস করেছেন—

> "মহানন্দাকে কেন্দ্র করে যারা ঘর বেঁধেছিল, যারা ভালোবেসেছিল, ভালোয় মন্দে নানা সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে যারা আলোড়িত হয়েছিল। উৎসবের ব্যসনে যারা নিত্যসঙ্গী ছিল, শ্মশানের পথে আজ তার সহযাত্রী। মাঝে মাঝে বনঝাউয়ের দীর্ঘ নিঃশ্বসিত আকুলতায় কিসের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় - স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় না। মহানন্দা মরে যাচ্ছে - আর মরে যাচ্ছে গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি। আত্মহত্যা আর অবক্ষয়।"[নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-১৬২]

মহানন্দার এই অবস্থার সঙ্গে উপন্যাসের নায়ক নীতীশকে তুলে ধরেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। শৈশব থকেই বাড়ির পাশের মহানন্দা নদীর সঙ্গে তার মনের নিবির সম্পর্ক। বর্ষায় নদীতে বান এলে তার মনের মধ্যেও যে ভাবের বান ডাকে। আবার নদীর দু'কূল প্লাবিত করে যখন জলের স্রোতধারা চারপাশকে প্লাবিত করে তখন নীতীশের চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের খরায় যখন নদীর শুকিয়ে গেলে, তার স্রোত থেমে গেলে নদীর জন্য নীতীশের হৃদয় কেঁদে ওঠে। এমনভাবে বারো মাসেই নদীর চলাচলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীতীশকে তুলে ধরেছেন। তারা যেন একে অপরের সহযোগী সত্তা (Co-being), নদীর সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা তার জীবন।

সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিচ্ছবি নয় - জীবনের সে অনুপ্রেরণাও। তাই বলা হয় 'Literature is the organ of nation'- অর্থাৎ সাহিত্য জাতির মুখপাত্র। জাতিকে যদি জাগাতে হয়, তাহলে সে দায়িত্ব তার সাহিত্য গ্রহণ করবে, বিশেষভাবে কথাসাহিত্য। সে দায়িত্ব অনেকটাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'শুধু প্রতিভাবানই নন, সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয়ও বটে। হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে পাঠকচিত্তকে চকিত-বিস্মিত করে তাঁর আবির্ভাব নয়, তাঁর উদয়াচল নিঃসঙ্গ মহিমায় নতুন নক্ষত্রের ধ্রুবজ্যোতিতে ক্রমশ-ভাস্বর হয়ে উঠেছে।'[২] স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ আর মহাযুদ্ধের পটভূমিতে তাঁর বিকাশ। সাম্রাজ্যবাদী অপশাসন, যুদ্ধের তাণ্ডব, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফিতি, চারিদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার চোখে দেখা এইসব ঘটনারাই যেন জীবন্ত চিত্রণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস। তিনি যে শুধুই সাহিত্যিক ছিলেন, তা নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিও তিনি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন স্কুল জীবন থেকেই। শুধু আকর্ষণই নয় 'দেশকে স্বাধীন করতে বিপ্লবীদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন পনেরো বছরের এক কিশোর। অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত থাকায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাজতবাসও করতে হয়েছিল তাকে।'[৩] দাদা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে বিষয় নিয়ে বলেছেন—

"দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি স্কুলজীবন থেকেই নারায়ণের তীব্র আকর্ষণ ছিল - বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি। তাই আমি যখন বিপ্লবী দলে যোগ দিলাম, তখন সে কথা তার কাছে লুকিয়ে রাখার কোনও প্রশ্নই ছিল না। আমার এ কাজে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। যদিও নারায়ণ নিয়মমতো আমাদের দলের কখনো সদস্য হয়নি, তা হলেও দলের জন্য কখনো কোনও কাজ করতে ও আপত্তি করেনি। এর মধ্যে অনেক কাজ যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল। যেমন, অস্ত্র ইত্যাদি লুকিয়ে রাখা বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া, চিঠিপত্র, বে-আইনি বই ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া।" একথার সত্যতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'শিল্পীর স্বাধীনতা'তে স্পষ্ট। আসলে যুগকে উপেক্ষা কারো দ্বারাই সম্ভব নয়; প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে তার প্রভাব পরবেই। সে সময়ে বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন দেশের সমস্যা তুলে ধরতে, সাধারণ মানুষকে জাগরূক করতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় -"বাংলাদেশের আরও অনেক লেখকের মতোই আমিও কলম ধরেছিলাম পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃষহন অগ্নি যন্ত্রণার মধ্যে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ। পড়েছি রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য, নজরুলের কবিতা, বাজেয়াপ্ত দেশের ডাক, ফাঁসির সত্যেন, আমাদের হাতে ঘুরেছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সর্বহারাদের গান, বিমল সেনের ফুলঝুরি, প্রেরণা দিচ্ছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের বেণু পত্রিকা, কানে বাজছে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আশ্চর্য পংক্তিগুলো : 'দারুণ দেবতার ডাক যারা পেল তার আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।' সে দিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কলম ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয় তবে স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।"[৪]

তাই 'মহানন্দা' উপন্যাসে আমরা দেখি গৌড়ভূমির সাধারণ জনজীবনের কথা দিয়ে উপন্যাসের শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা রাজনৈতিক মোর নিয়েছে। উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক মতো বিরোধ এখানে নেই। তবে পরাধীনতার গ্লানি ও স্বদেশিকতার যে আগুন সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্বলছিল নীতীশের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই তা প্রস্ফুট। দেশের জন্য জীবন দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচনার যে স্বাদ তা মাত্র সতেরো বছর বয়সে সে উপলব্ধি করেছিল। তবে নীতীশ একাই এখানে রাজনৈতিক চরিত্র নয়; তাকে পূর্ণতা দিয়েছে অলকা। আবার অলকাকে দীপ্ত করেছে বীণা।

জেল থেকে ফিরে এসে অনেক রাজবন্দী স্বাভাবিক জীবন শুরু করলেও, নীতীশ তা পারেনি। দেশের জন্য, দশের জন্য কিছু একটা করার নেশা তাকে তাড়িয় নিয়ে বেড়িয়েছে। কাজ একটা শুরু করতে হবে, কিন্তু কীভাবে? এই আত্মজিজ্ঞাসা, 'কিছু একটা করবার আকুলতা সমস্ত চৈতন্যকে পীড়িত করে তুলেছে, অথচ কী করা যেতে পারে তার কোনও উত্তর মিলছে না মনের কাছে। বারো বছর ধরে যে শক্তিটা তিল তিল করে নেপথ্যে সঞ্চিত হয়েছে', তা তার কাছে অন্ধকার বোবা ঢেউয়ের মতো মনে হয়েছে। এখানে নীতীশের চিন্তা-চেতনাকে দিশা দিতে, তার জীবনের পথ চিনিয়ে দিতে লেখক উপস্থিত করলেন অলকাকে। তবে এখানে একইসাথে লেখক দেখালেন স্বদেশি আন্দোলনে নারীর ভূমিকাও। সময় পাল্টেছে, পরিবর্তন হচ্ছে নারীর ভূমিকাও। গ্রাম বাংলার মেয়েরাও আর কোনও বিষয়ে পিছিয়ে নেই। নীতীশের পুরোনো ধারণার ভুল ধরিয়ে দিয়েছে অলকা - "সূর্যের আলো যখন পড়ে তখন সকলের চোখেই পড়ে। মেয়েরা এমন কি অপরাধ করেছে যে ওদের চিরকালের জন্য অন্ধকারের বাসিন্দা বলে ধরে নেবেন? পৃথিবী যদি বদলে থাকে তাহলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা বদলেছে। অন্তত সেটাই আশা করবেন।"

বারো বছর আগের যে সমাজ তা এখন পরিবর্তন হয়েছে এবং গ্রাম বাঙলাতেও যে তার ঢেউ এসে লেগেছে। পরিবর্তনের ডাকে মেয়েরাও সাড়া দিয়েছে। অলকার কথায় নীতীশের তা'ই উপলব্ধি ঘটেছে—

"অতীতে একটা যুগ ছিল - সে যুগ রূপকথার, সে যুগ প্রেমের; সে যুগ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কালো চোখে ঘনিয়ে আনত ইংরেজি কবিতার স্বপ্ন, সে যুগে মেয়েদের তনুশ্রী দুলিয়ে দিত সুইনবার্ণের

> কবিতার ছন্দ, অলিভপত্র মর্মরিত ছায়াবীথির তলা দিয়ে সে যুগের মন তীর্থ যাত্রা করত প্যাগান ভাস্কর্যের গম্ভীর উদার মহিমায় বিমণ্ডিত ভেনাসের দেবায়তনে। সে যুগের রাসায়নিক পরশ-পাথর তৈরি করতে চেয়েছিলেন - তাঁদের বৈজ্ঞানিক ভানা প্রতিফলিত হয়েছিল প্রেমের ভেতরে, তাঁরা বলেছিলেন এই প্রেম লোহার গড়া মনকে সোনা করে দেয়। আজ তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ বিদ্যা মেয়েদের চোখে শুধু স্বপ্ন আনেনি, এনেছে দীপ্তি; আজকের মন ভেনাসের মন্দিরে অর্ঘ্য সাজিয়ে অগ্রসর হয়নি ; মৌসুমি ফুলের কেয়ারী সাজানো নিভৃত নিরুদ্বিগ্ন অ্যাশ্‌ফল্টের পথ ছাড়িয়ে সে নেমে আসছে সংবাদ মুখরিত পীচগলা রৌদ্রদগ্ধ রাজপথে, আজকের পরশপাথর লোহাকে সোনা নয়, একখানা উজ্জ্বল তলোয়ার। অলকার মধ্যেও কি আছে সে তলোয়ারের ইঙ্গিত?"[নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-১৭৮]

কীভাবে দেশকে দেখতে হয়, দেশ সেবার কাজের শুরুর ইঙ্গিত বয়সে অনেক ছোটো অলকার কাছ থেকে সে জ্ঞান নীতীশ পেয়েছে। বৃহত্তর দেশ ছোটো ছোটো সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এবং দেশকে ঠিক করে বুঝতে হলে নিজের সমাজকে আগে চিনতে হবে, অন্যকে বোঝার আগে নিজেকে ঠিক বুঝতে হবে। এই শিক্ষা লাভ করায় নিজের মাতৃভূমিকে যোধপুর থেকেই নীতীশ নিজের কাজ শুরু করেছে। সাফল্যও পেয়েছিল। গ্রামের কিশোর ছেলেমেয়েরা তাকে তাদের প্রতিনিধি করেছে। সুভাষের দল তাকে 'জাগরণী সংঘে'র সাথে যুক্ত করেছে। যা চেয়েছিল নীতীশ, দেশের সেবা তার চলা সে এখান থকেই শুরু করতে চেয়েছে। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, নাইট স্কুল গড়ে একটা আদর্শ গ্রামের প্রতিষ্ঠা করে দেশের সেবা করতে চেয়েছে। কিন্তু এভাবেও যে প্রকৃত অর্থে দেশের সেবার নামে, বিপ্লবের নামে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো।

অলকার সাথে নীতীশের কথোপকথনে দেশ সম্পর্কিত ভাবনা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। আসলে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাবনাকেই অলকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সমগ্র ভারতভূমির বিপ্লবী যুবকদের সঠিক পথ দেখাতে চেয়েছেন এখানে তিনি। গ্রামের স্কুলের ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারি অলকার বিপ্লবী রাজনীতির সমালোচনায় ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সচেতন রাজনৈতিক দর্শনের ছাপ লক্ষ করা যায়। শুধু নিজের গ্রাম উন্নয়নে ব্যস্ত নীতীশকে সে বলেছ -"ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে যোধপুর স্বাধীন হতে পারে না। চল্লিশ কোটি মানুষের হিসাব না রেখে তিন হাজার মানুষের ভেতরে বিপ্লব অসম্ভব। যে কাজের মধ্য দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন আপনারা, তার পরিণতিও তো আপনারা চোখেই দেখেছেন। বিপ্লবের পেছনে অনেকখানি সংগঠন চাই। সব সমস্যার মূল সেখানেই আছে।"

ঔপন্যাসিক শুধু নীতীশের কথাই বলেননি। সমগ্র উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের সঠিক পন্থার সন্ধান করেছেন। নীতীশের সহযোদ্ধা, যারা তার সাথে জেলে বন্দী থেকেছে, তাদের মধ্যে একজন প্রকাশ দত্তের কথায় লেখক সমগ্র বিপ্লবীদের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন—

> "রাজবন্দী প্রকাশ দত্ত নয়, ব্যাঙ্কের কেরানি, নীল খামে বৌকে চিঠি লেখা প্রকাশ দত্ত, যে আজ 'লাল-বিপ্লবীদের উৎপাতে প্রায় ঝালাপালা হয়ে উঠেছে - এটাই যেন স্বাভাবিক পরিণাম।"[নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-২৯২]

বিপ্লবীরা কোন রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করবে, তাদের সঠিক পথ কোনটি এ প্রশ্ন শুধু নীতীশের নয়; সব বিপ্লবীদেরই এই প্রশ্নটি ছিল। তাই জেলে বসে পড়াশুনা করে নীতীশ বুঝতে পেরেছে আগের মতো চললে এখন আর হবে না। নিজেদের কার্য পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। কেননা সময়-সমাজ অবিরত পরিবর্তনশীল। নতুন সময়ে নতুন ভাবনা নিয়ে এগোতে হবে। তাই এখন আর 'তিনটে সাহেবকে সাবাড় করে আরও তেত্রিশটা ডেকে আনা হবে মাত্র। তাতে না মেলে দেশের লোকের সহানুভূতি, না পাওয়া যায় সহায়তা। সুতরাং বেশ বড়ো করে

আরম্ভ করা দরকার। সমস্ত মানুষের হাতে হাতিয়ার তুলে দেয়া চাই, তিনটে রিভলভার আর দুটো পিস্তলের কাজ নয়।'

গ্রাম থকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখলেও গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয় একসময় নীতীশকে। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিতেও মহানন্দার প্রভাব লেখক উল্লেখ করেন। মহানন্দা ছেড়ে চলে গেলেও 'মহানন্দার মতো আবার তাকে খুঁজে নিতে হবে কোনও অনিবার্য হিমালয়ের উষারশিখর, কোনও বরফগলা কুশীনদীর পাহারভাঙা নীল প্রবাহ।' নদীর গতী তাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং মানুষের ক্ষেত্রেও এটিই চির সত্য। আর নীতীশের জীবনের যে উদ্দেশ্য সেখানে থেমে থাকার অবকাশ নেই। সে কিছু করতে চায়। কেননা জেল থেকে বেরিয়ে যে নতুন জীবন ও ভাবনা সে লাভ করেছে তাকে অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো করে হারাতে চায় না। তাই কোলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিমাংশু যখন তাকে তাদের আন্দোলনে যোগ দিতে বলে, কিছুটা দ্বিধা থাকলেও নীতীশ সামিল হয় শ্রমিক আন্দোলনে। কিছুটা মতের মিল না হলেও যে কোনও রূপে যে একটা সূচনা চাই। নীতীশ বলে—

> "তোমাদের দলে চলে এলাম। কতদূর চলতে পারবো জানি না, হয়তো পার্থক্যও থকে যাবে দৃষ্টভঙ্গির। কিন্তু সেটা বড়ো নয়। লড়াই যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ভারতে শাসনতন্ত্র কী হবে, তা নিয়ে ভাবনা না করে পথে নেমে লড়াই সবচেয়ে বেশি দরকারি।"[নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-৩৪৫]

উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক চরমপন্থি ও নরমপন্থী দুই ধরণের ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক। দুবছর বক্সার জেলে সংশোধিত ফৌজদারি মামলায় বন্দী থাকাকালীন নীতীশের অন্যান্য বন্দীদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে সময় পর্বে রাজনৈতিক চিন্তাধারাও পরিবর্তন ঘটে। নীতীশেরও চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। ব্রজেনদার স্টাডিসার্কেলে তার পরিচয় ঘটে লেনিনিজমের সাথে। অন্যান্য বন্দীদের কথা তাকে উদ্দীপ্ত করে। বিশ্বব্যাপী যখন পরিবর্তনের ডাক তখন চিন্তাধারা পরিবর্তন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। শচীন বলে 'চোখ দুটো এবার খোলো। এ যুগেও নিহিলিজ্‌ম চলবে না। ওই ফলস্‌ হিরো ডি-ভ্যালেরা আর সিন্‌ফিন্‌ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ো না। দ্যাখো পৃথিবী কোনদিকে এগোচ্ছে।'

স্টাডিসার্কেলে নীতীশ এবং অন্যান্যদের আলোচনা চলতে থাকে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বোমা পিস্তলের অভাব তাদের বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করেনি। যে রুশ বিপ্লবের চেতনাকে তারা জালালাবাদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখত, সেখানে দেখল তার ধর্ম আলাদা, তার রূপ স্বতন্ত্র। অনেক তর্ক-বিতর্কে বিরুদ্ধ দলের নেতা হল নীতীশ। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিপ্লবের শান্ত পরিবেশ তাকে উদ্দীপ্ত করে না। তাই নীতীশের বার বার মনে হয়েছে—

> "অত প্রলিটারেয়টপ্রীতি তার নেই; যুক্তি আর তথ্যের ভারে আকীর্ণ ওই নিরামিষ বিপ্লব তার আর পছন্দ হয় না। বোমার ফিউজের মতো তার রক্ত বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করে আছে - পলাশীর মাঠে যেভাবে ইংরেজ প্রথম পা বাড়িয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই তাকে ইংলিশ চ্যানেল পার করে দিতে হবে। সোশ্যালিজম? হাঁ-ও কথাটায় আপত্তি নেই, ওটা সেও চায়। কিন্তু ক্লাইভের উত্তরাধিকারীদের আগে বিদায় করো, ওসব ভালো ভালো কথা তারপরে বিচার করা যাবে।" [নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃ-২০৫]

এই নীতীশের ভাবনারই আবার পরিবর্তন দেখা যায় জেল থেকে মুক্তির পর। নিজের গ্রাম উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের তার প্রয়াস। যদিও তার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাই উপন্যাসের শেষের অংশে আমরা আবার দেখি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় নীতীশ। তবে শুধু যে একটা শুরু চাইছিল সে শুধুমাত্র তাই নয় এখানে আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক দিক কাজ করেছে। একদিকে স্ত্রী মল্লিকাকে পেয়েও না পাওয়া, অন্যদিকে পিতার ভণ্ডামি। অলকাকে ধীরে ধীরে ভালোলাগতে থালেও সে ভালোলাগার অবদমনে তার মানসিক দ্বন্দ্ব। এই পরিস্থিতিতে

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সে অলকাকে পেয়েছে, অলকাও তাকে গ্রহণ করেছে। পুরোনোকে পিছনে ফেলে নতুন করে শুরু করেছে তাদের আন্দোলন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যেখানে মূল কথা সেখানে সবাইকে একত্রিত করে বিপ্লবকে সার্থক করার নতুন প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

সূত্র নির্দেশ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার - 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পুনর্মুদ্রণ ২০০৪-২০০৫, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পৃষ্ঠা - ৬২৬।
২. ভট্টাচার্য, জগদীশ- সম্পাদক 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' -ভূমিকা, প্রকাশভবন, কোলকাতা, ত্রয়োদশমুদ্রণ, ১৪১৫, পৃষ্ঠা - ৫।
৩. আনন্দবাজার পত্রিকা - কলকাতার কড়চা, শতবর্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯ শে জুন, ২০১৭।
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ - 'শিল্পীর স্বাধীনতা', দেশ, ২০ শে পৌষ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৮৯৫।

মূল গ্রন্থ :

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশস, ১৩৫৯।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

১. দত্ত, সরোজ - কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।
২. ভট্টাচার্য, জগদীশ- 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী', ভারবি, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৪।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রার্থপ্রতিম 'উপন্যাস রাজনৈতিক', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯১।